INTERNATIONAL PEER-REVIEWED RESEARCH JOURNAL OF SATYA RANJAN COLLEGE (IPRJSRC)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary Multilingual Research Journal

E-ISSN: _____ P-ISSN: _____

DOI: _____

Volume I, Issue I, November 2026, Page No: 40-47

Published by Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Website: https://srcjournal.org/

ইকোফেমিনিজম এবং অমিতাভ ঘোষের 'দ্য হাংরি টাইড': নারী ও প্রকৃতির মেলবন্ধন

Susanta Mondal

Guest Lecturer, Dept. of Bengali, Jogamaya Devi College, Kolkata, West Bengal, India

Abstract

Ecofeminism, or ecological feminism, is a theoretical perspective that highlights the parallel exploitation of women and nature. Just as patriarchal society seeks to control women, the capitalist system tends to exploit, dominate, and destroy nature for its own benefit. This ideology connects the protection of women with the preservation of the natural environment. Amitav Ghosh's celebrated novel The Hungry Tide offers a remarkable representation of this perspective. Set against the backdrop of the Sundarbans, the novel vividly portrays the conflict between human beings, wildlife, and state power. Here, nature is not merely an inert setting but a living and active presence. Kusum, one of the central female characters, represents a woman who has been severely marginalised by society. Despite being subjected to patriarchy and poverty, she never surrenders. Against the historical backdrop of the Morichjhapi incident, the novel depicts how the state, in the name of tiger conservation under Project Tiger, attempts to evict thousands of impoverished people. Kusum courageously stands up to defend the rights of her community. She ultimately sacrifices her life in resistance to an inhuman, Western-oriented model of environmental conservation. She shares a profound spiritual bond with the rivers and natural environment of the Sundarbans. After her death, she symbolically emerges as a powerful storm of resistance against patriarchy and imperialism.

On the other hand, Piya Roy, an American marine biologist, arrives in the Sundarbans to conduct research on dolphins. Initially, she perceives everything exclusively through the lens of scientific knowledge. However, her encounter with Fokir, the son of Kusum, gradually transforms her understanding. During a devastating cyclone, Fokir sacrifices his life to save Piya. Through this experience, Piya realises that nature cannot be protected through scientific knowledge alone without the active participation of local communities. Consequently, she initiates a conservation project named after Fokir, involving the local people. The novel thus conveys the message that women and nature are not merely victims of exploitation; they are also powerful and resilient forces of resistance against injustice. To preserve the beauty and ecological balance of the Earth, it is essential to ensure the peaceful coexistence of human beings and nature rather than perpetuating human domination over the natural world.

Keywords: Ecofeminism, Marginalised Women and Resistance, Morichjhapi Massacre, Human-Nature Coexistence, The Hungry Tide.

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স যত বেড়েছে, মানুষের সভ্যতার রথ তত বেশি করে প্রকৃতির ওপর দিয়ে নিজের চাকার দাগ কেটে এগিয়ে গেছে। প্রাচীনকালে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে এক নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল, আধুনিকতার অহংকার এবং আধিপত্য বিস্তারের নেশায় তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা যদি গভীরভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব যে এই পৃথিবীতে যারা দুর্বল বা প্রান্তিক, তাদের ওপর সবসময় বিজয়ীর অধিকার কায়েম করা হয়েছে। আর এই শোষণের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটি সত্তা—নারী এবং প্রকৃতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিক যে দৃষ্টিতে এবং যে যুক্তিতে একদিকের বনভূমি, নদী বা পাহাড়কে শোষণ করে, ঠিক সেই একই যুক্তিতে তারা নারীর শরীর, মন ও অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নারী এবং প্রকৃতির ওপর চলা এই সমান্তরাল শোষণের বিরুদ্ধেই বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এক প্রবল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম হয়, যার নাম 'ইকোফেমিনিজম' বা পরিবেশবাদী নারীবাদ। ফরাসি নারীবাদী ফ্রাঁসোয়া দোবন (Francoise d' Eaubonne) তাঁর 'Feminisme ou la mort' বা 'Feminism or Death' বইয়ে সর্বপ্রথম এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। এরপর থেকেই বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলন এবং নারী অধিকারের আন্দোলন এক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়, যেখানে বুঝতে শেখানো হয় যে এই দুই লড়াই কোনোভাবেই আলাদা নয়।

পরিবেশবাদী নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম আসলে কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন মতবাদ নয়, বরং এটি অনেকগুলো আন্তঃসম্পর্কিত চিন্তাধারার এক অপূর্ব সংশ্লেষ। পশ্চিমা দার্শনিক ঐতিহ্যে প্রাচীনকাল থেকেই দ্বৈতবাদ বা ডুয়ালিজমের একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এই দ্বৈতবাদে সবসময় দুটি বিপরীত সত্তাকে দাঁড় করানো হয় এবং একটিকে অপরটির চেয়ে উচ্চতর বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন— মন ও দেহ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি, পুরুষ ও নারী, যুক্তি ও আবেগ। দেকার্তীয় এই দর্শনে মন, সংস্কৃতি, পুরুষ এবং যুক্তিকে সবসময় উচ্চতর এবং শাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে দেহ, প্রকৃতি, নারী এবং আবেগকে দেখানো হয়েছে নিম্নতর, শাসিত এবং নিষ্ক্রিয় হিসেবে। এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদ প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত সত্তার বদলে নিছক একটি যান্ত্রিক সম্পদে পরিণত করেছে। প্রখ্যাত তাত্ত্বিক গ্রেটা গার্ড তাঁর সম্পাদিত 'Ecofeminism: Women, Animals, Nature' গ্রন্থে এই মতবাদের মূল ভিত্তিটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন—

> "Ecofeminism is a theory that has evolved from various fields of feminist inquiry and activism... its basic premise is that the ideology which authorizes oppressions such as those based on race, class, gender, sexuality, physical abilities, and species is the same ideology which sanctions the oppression of nature."[১]

অর্থাৎ, ইকোফেমিনিজমের মূল কথা হল, যে আদর্শগত কাঠামো বা মনস্তত্ত্ব সমাজে বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ, যৌনতা বা প্রজাতির ওপর ভিত্তি করে শোষণকে বৈধতা দেয়, ঠিক সেই একই কাঠামো প্রকৃতির ওপর শোষণকেও মান্যতা দেয়। তাই প্রকৃতির মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্ভব নয়, আবার নারীর মুক্তি ছাড়া সমাজ থেকে প্রকৃতির ওপর শোষণ বন্ধ করাও অসম্ভব।

লরি গ্রুয়েন তাঁর 'Dismantling Oppression' প্রবন্ধে এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারী এবং প্রকৃতিকে একই সমতলে ফেলে একটি নীরব 'অন্য' বা 'Other'-এ পরিণত করে রেখেছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> "The categories 'woman' and 'animal' serve the same symbolic function in patriarchal society. Their construction as dominated, submissive 'other' in theoretical discourse has sustained human male dominance."[২]

অর্থাৎ তাত্ত্বিক আলোচনায় নারী এবং প্রাণীকে যেভাবে সবসময় অবদমিত এবং আজ্ঞাবহ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে, তা আসলে মানুষের সমাজে পুরুষের আধিপত্যকেই টিকিয়ে রেখেছে। নারী ও প্রকৃতি উভয়ের সাথেই 'উর্বরতা' এবং 'মাতৃত্ব'-এর একটি রূপক জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজ মনে করে, প্রকৃতির মতো নারীও এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, যার কাজ কেবল নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যাওয়া এবং যার ওপর যথেচ্ছভাবে অধিকার ফলানো যায়।

কিন্তু বাস্তব চিত্রটি হল, পরিবেশ এবং প্রকৃতির সাথে নারীদের, বিশেষত গ্রামীণ এবং প্রান্তিক নারীদের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তা আর কারও নেই। গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই যখন পরিবেশের ওপর কোনো দুর্যোগ নেমে আসে বা পুঁজিবাদী আগ্রাসনে বনভূমি ও নদী ধ্বংস হয়, তখন তার প্রথম এবং সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাবটি পড়ে নারীদের ওপরই। পানীয় জলের অভাব থেকে শুরু করে খাদ্যের অভাব—সবকিছুর সাথেই নারীদের সরাসরি লড়াই করতে হয়। তাই পরিবেশ রক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মূল্যায়ন ছাড়া কোনোভাবেই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভব নয়। Ynestra King -এর একটি বিখ্যাত উক্তি লরি গ্রুয়েন তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "Life on earth is an interconnected web, not a hierarchy."[৩] অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি জীবন একে অপরের সাথে জালের মতো জড়িয়ে আছে, এখানে কেউ কারও চেয়ে বড় বা ছোট নয়। ইকোফেমিনিজম আমাদের এই সাম্যবাদ ও সহাবস্থানের শিক্ষাই দেয়।

ইকোফেমিনিজমের এই গভীর তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক কাঠামোর এক অসামান্য ও জীবন্ত সাহিত্যিক প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষের (জন্ম ১৯৫৬) যুগান্তকারী উপন্যাস 'দ্য হাংরি টাইড' (The Hungry Tide)-এ। ২০০৪ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির মূল পটভূমি হল বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে থাকা সুন্দরবনের এক জটিল, রহস্যময় এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল ম্যানগ্রোভ বদ্বীপ। সুন্দরবন এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে মানুষের তৈরি কোনো স্থায়ী নিয়ম খাটে না। এখানে দিনে দুবার জোয়ার-ভাটার কারণে ভৌগোলিক রূপ পরিবর্তিত হয়। জল ও স্থলের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই, বরং তারা একে অপরের সাথে নিরন্তর এক সংঘাত এবং মিলনের খেলায় মত্ত থাকে। এই ভয়ংকর সুন্দর ভূখণ্ডে মানুষের জীবন অত্যন্ত বিপন্ন ও অনিশ্চিত। একদিকে যেমন গভীর জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, নদীর জলে কুমির ও হাঙর, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে ভয়ংকর সব ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস। প্রকৃতি এখানে কোনো নিষ্প্রাণ পটভূমি বা নিষ্ক্রিয় মঞ্চ নয়, বরং প্রকৃতি নিজেই এই উপন্যাসের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী, সক্রিয় এবং জীবন্ত চরিত্র।

অমিতাভ ঘোষ এই উপন্যাসের মাধ্যমে মানুষ, প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যকার এক জটিল ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ইকোফেমিনিজমের আলোকে এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও পিতৃতন্ত্রের যাতাকলে প্রান্তিক মানুষেরা, বিশেষ করে নারীরা শোষিত হয়েছে এবং কীভাবে তারা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সেই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। উপন্যাসের একদম কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ও মর্মান্তিক ঘটনা 'মরীচঝাঁপি গণহত্যা'। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য হিন্দু ও

নমশূদ্র বাস্তুচ্যুত মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সরকার তাদের পাঠিয়ে দেয় মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য শিবিরের রুক্ষ, শুষ্ক ও বৈরী পরিবেশে। কিন্তু সেই শুষ্ক পাথরঘেরা পরিবেশ নদীমাতৃক বাংলার মানুষদের কাছে ছিল এক জীবন্ত নরকের মতো। তাই ১৯৭৮ সালের দিকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ দণ্ডকারণ্য থেকে পালিয়ে এসে সুন্দরবনের মরীচঝাঁপি দ্বীপে আশ্রয় নেয়। তারা চেয়েছিল নিজেদের পরিচিত নদীমাতৃক পরিবেশে, মাছ ধরে ও কৃষিকাজ করে নতুন করে এক স্বাধীন জীবন শুরু করতে। তারা সেখানে স্কুল, হাসপাতাল, এবং নিজেদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজও গড়ে তুলেছিল।

কিন্তু ভারত সরকার এবং পুলিশ বাহিনী তাদের এই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকাকে মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, মরীচঝাঁপি দ্বীপটি 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' বা Project Tiger-এর অন্তর্গত একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এটি কেবল বাঘ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট, কোনো মানুষের বাসস্থানের জন্য নয়। পশ্চিমা ধাঁচের এই পরিবেশ সংরক্ষণ বা তথাকথিত কনজারভেশনের নামে সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এই নিরীহ মানুষদের উচ্ছেদ করতে শুরু করে। পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, পুলিশের গুলিতে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায় এবং দ্বীপটিকে আক্ষরিক অর্থেই রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি ইকোফেমিনিজমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যখন পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলে, তখন তারা আসলে সেই পরিবেশের আদিম বা প্রান্তিক বাসিন্দাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। পশ্চিমা সংরক্ষণ মডেলে প্রকৃতি এবং মানুষকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা হয় এবং বাঘ বাঁচানোর নামে গরিব, দলিত ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনকে ধুলোর চেয়েও সস্তা মনে করা হয়।

এই চরম অন্যায় ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র 'কুসুম' এক জ্বলন্ত প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের তত্ত্ব অনুযায়ী কুসুম হল একজন 'সাবঅল্টার্ন' (Subaltern) বা প্রান্তিক নারী, সমাজের চোখে যার নিজস্ব কোনো কণ্ঠস্বর বা অধিকার নেই। কুসুমের সমগ্র জীবনটাই হল ঔপনিবেশিকতা, চরম দারিদ্র্য এবং পিতৃতন্ত্রের যাঁতাকলে গভীরভাবে পিষ্ট হওয়ার এক করুণ আখ্যান। ছোটবেলায় সুন্দরবনের এক খাঁড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে এক ভয়াবহ বাঘের আক্রমণে কুসুমের বাবার মৃত্যু হয়। কিন্তু তার বাবার মাছ ধরার কোনো সরকারি পারমিট বা অনুমতিপত্র না থাকার কারণে রাষ্ট্র তার মাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় না। চরম দারিদ্র্য এবং অসহায়ত্বের শিকার হয়ে তার মাকে দিলীপ চৌধুরী নামক এক জোতদারের প্রতারণায় পড়ে কলকাতায় গিয়ে বাধ্য হয়ে দেহব্যবসা বেছে নিতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই একজন অসহায় নারীকে তার শরীর বিক্রি করতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে সেই একই লোভী জোতদার কুসুমকেও তার মায়ের মতো দেহব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ, নারী এখানে নিছকই একটি ভোগের বস্তু বা পণ্য। কিন্তু কুসুমের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হরেণ নস্কর তাকে উদ্ধার করে। এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সবসময় নারীকে কোনো না কোনো পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য করে এবং তার নিজস্ব স্বাধীনতা বা আত্মপরিচয়কে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চায়।

কিন্তু কুসুম দমে যাওয়ার পাত্রী ছিল না। সে তার মাকে বাঁচানোর জন্য কলকাতায় পাড়ি দেয় এবং রাজেন নামের এক ব্যক্তির সাহায্যে মাকে উদ্ধার করে এক নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করে। সেখানেই তার সন্তান ফকিরের জন্ম হয়। এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে কুসুম ফিরে আসে সুন্দরবনে এবং যোগ দেয় মরীচঝাঁপির সেই প্রতিবাদী মানুষদের দলে। মরীচঝাঁপিতে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী যখন মাইকে করে ঘোষণা দেয় যে এই জায়গা মানুষের জন্য নয়, তখন কুসুমের ভেতরের জমে থাকা সমস্ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণা

এক আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে। অমিতাভ ঘোষ তাঁর লেখায় কুসুমের জবানিতে এই রাষ্ট্রীয় অমানবিকতার ভয়াবহ চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন,

> "It was to sit here, helpless, and listen to the policemen making their announcements, hearing them say that our lives, our existence, were worth less than dirt or dust."[৪]

এই উক্তিটি শুধু কুসুমের নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তিক মানুষের এক চিরন্তন হাহাকার, যেখানে ক্ষমতার আস্ফালনে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে ধুলোর চেয়েও সস্তা এবং মূল্যহীন মনে করা হয়।

মরীচঝাঁপি দ্বীপে কুসুম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ায়। সে দ্বীপ ছাড়তে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। সে তার সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের জন্য, নিজের ভিটেমাটি রক্ষার জন্য নির্ভীকভাবে পুলিশের বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের নির্মম গুলিতে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়। কুসুমের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, তৃতীয় বিশ্বের নারীরা কীভাবে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, পরিবেশগত শোষণ এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করে। কুসুম এখানে কেবল একজন নারী নয়, সে হয়ে ওঠে সমগ্র প্রকৃতির এক মানবীয় রূপ। তার এই অদম্য প্রতিরোধ কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং প্রকৃতির সাথে তার গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগেরও একটি অচ্ছেদ্য অংশ। ইকোফেমিনিস্ট তাত্ত্বিক Val Plumwood যেমনটা বলেছেন, নারী এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যেখানে তারা একে অপরের ক্ষতি না করে পরিপূরক হয়ে ওঠে। সুন্দরবনের পরিবর্তনশীল এবং বাঁধনহীন জলজ পরিবেশ কুসুমকে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে প্রতিবাদ করার শক্তি জোগায়।

প্রকৃতি যেন কুসুমের সাথে কথা বলে। সে বিশ্বাস করে যে সুন্দরবনের জলে ঘুরে বেড়ানো ইরাবতী ডলফিন বা শুশুকেরা হল দেবতা বনবিবির দূত। এই ডলফিনদের সাথে তার যেন এক ঐশ্বরিক নাড়ির টান রয়েছে। পুলিশের গুলিতে কুসুমের মৃত্যুর পরও সে যেন চিরকালের জন্য প্রকৃতির একটি অদম্য এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। উপন্যাসে অমিতাভ ঘোষ তাকে বারবার একটি প্রবল ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঝড় যেমন একটি বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রতীক, কুসুমও ঠিক তেমনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রতিবাদ। তার এই জীবন এবং মৃত্যু ইকোফেমিনিজমের এক নিখুঁত উদাহরণ, যেখানে একজন প্রান্তিক নারী নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে যায় যে, জল, জঙ্গল এবং জমির ওপর স্থানীয় মানুষের অধিকার কোনো মতেই কেড়ে নেওয়া যায় না।

কুসুমের এই লড়াই এবং আত্মত্যাগের গল্প সুন্দরবনের বাতাসে, জলে এবং ম্যানগ্রোভের শিকড়ে শিকড়ে চিরকাল থেকে যায়। তার মৃত্যু হলেও তার রেখে যাওয়া আদর্শ এবং প্রকৃতির প্রতি তার সেই অকৃত্রিম ভালোবাসা বেঁচে থাকে তার ছেলে ফকিরের মধ্যে। আর এই ফকিরের মাধ্যমেই উপন্যাসের অপর এক মেরুর চরিত্র, আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী পিয়া রায়ের জীবনে আসে এক বিশাল পরিবর্তন। পিয়া একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী (Marine Biologist), যে সুন্দরবনে বিপন্ন প্রজাতির ইরাবতী ডলফিন (Orcaella brevirostris) নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে আসে। প্রথমদিকে পিয়া মূলত পশ্চিমা আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তি এবং আধুনিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। তার কাছে প্রকৃতি ছিল কেবলই গবেষণার একটি বস্তু বা ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্র। পশ্চিমা বিজ্ঞান সবসময় প্রকৃতিকে মানুষের থেকে আলাদা করে দেখে এবং তাকে গবেষণাগারের একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। পিয়াও

শুরুতে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সুন্দরবনে এসেছিল। কিন্তু সুন্দরবনের গভীরে এসে সে স্থানীয় অশিক্ষিত জেলে ফকিরের (কুসুমের ছেলে) সাথে পরিচিত হয়।

ফকিরের কাছে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো প্রথাগত ডিগ্রি না থাকলেও সুন্দরবনের নদীপথ, জোয়ার-ভাটা এবং প্রকৃতির নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে তার অসীম ও গভীর জ্ঞান রয়েছে। ফকিরের সাথে নৌকায় যাত্রাপথে পিয়া ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞানই সবকিছুর শেষ কথা নয় এবং প্রকৃতির সাথে স্থানীয় মানুষের একটি পবিত্র, আধ্যাত্মিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। উপন্যাসে পিয়ার এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং ফকিরের চিরাচরিত স্থানীয় জ্ঞানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় তৈরি হয়, তা ইকোফেমিনিজমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে স্থানীয় ও আদিবাসী পরিবেশগত জ্ঞানের এই যে টানাপোড়েন, তা উপন্যাসের অন্যতম মূল উপজীব্য। পিয়ার বিজ্ঞাননির্ভর তথ্যের পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের মৌখিক ঐতিহ্য এবং লোকজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটে ফকিরের মাধ্যমে।

এই উপন্যাসে পরিবেশগত নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজমের আরেকটি অত্যন্ত শক্তিশালী দিক ফুটে উঠেছে নীলিমা বসুর চরিত্রের মাধ্যমে। নীলিমা কলকাতা থেকে সুন্দরবনের লুসিবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে একটি স্থানীয় নারী সংগঠন তৈরি করেন। তিনি সেখানে একটি হাসপাতাল পরিচালনা করেন এবং নারীদের অধিকার ও পরিবেশ রক্ষার জন্য এক দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যান। নীলিমার এই সমাজসংস্কারমূলক কাজ প্রমাণ করে যে, পরিবেশগত সংকট এবং নারীদের সামাজিক অধিকারের লড়াই একে অপরের পরিপূরক।

ইকোফেমিনিজমের তাত্ত্বিক আলোচনায় মিথ বা লোককাহিনির গুরুত্ব অপরিসীম। 'দ্য হাংরি টাইড' উপন্যাসে 'বনবিবি'র মিথ বা উপাখ্যান একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত পরিচয়ের সাথে বনবিবির মিথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বনবিবি হলেন একজন নারী দেবতা, যিনি একইসাথে মানুষ এবং পরিবেশ উভয়কেই রক্ষা করেন। তিনি প্রকৃতির ওপর মানুষের আগ্রাসনকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনই বন্যপ্রাণীর হাত থেকে সাধারণ মানুষকেও বাঁচান। বনবিবির এই উপস্থিতি ইকোফেমিনিজমের সেই যুক্তিকেই সুদৃঢ় করে, যেখানে বলা হয় যে দেশীয় এবং নারীসুলভ জ্ঞান বা বিশ্বাস ব্যবস্থা পুঁজিবাদী এবং পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিপরীতে একটি টেকসই বিকল্প প্রদান করতে পারে। ফকির ডলফিনদের কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু হিসেবে দেখে না, বরং সে বিশ্বাস করে যে এই ডলফিনরা হল তার মৃত মা কুসুমের সাথে যোগাযোগের এক ঐশ্বরিক মাধ্যম এবং বনবিবির দূত।

উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্স ঘনীভূত হয় এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বা 'হাংরি টাইড'-এর মাধ্যমে। প্রকৃতি যখন তার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, তখন মানুষের তৈরি সমস্ত অহংকার এবং বৈজ্ঞানিক দম্ভ মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অমিতাভ ঘোষ সুন্দরবনের এই প্রলয়ংকরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা একাধারে ভয়ংকর ও বিস্ময়কর। উপন্যাসে এই ঝড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল এক ঘূর্ণায়মান পাতার গালিচার ওপর, যেখানে সাধারণ নদীর স্রোত বা ঢেউয়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বরং সমগ্র দ্বীপটি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝেও একটি সাদা পাখির ঝাঁক ঝড়ের কেন্দ্রস্থলের শান্ত পরিবেশে আশ্রয় নিয়েছিল, যা দেখে পিয়া উপলব্ধি করে প্রকৃতির এক অসীম রহস্যময়তাকে।

এই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ফকির নিজের শরীর দিয়ে আগলে রেখে পিয়াকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং নিজে প্রাণ হারায়। ফকিরের এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পিয়ার পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিকে

সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। প্রকৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান ও আধুনিকতা কখনোই স্থানীয় মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিবেশকে বাঁচাতে পারে না। লেখকের বর্ণনায় ফুটে ওঠে সেই দৃশ্য—

> Piya opened her eyes and was amazed by what she saw. A full moon was shining down on them from the top of what seemed to be a twisting well, a whirling stovepipe that reached far into the heavens. The light of the moon was shining through this spinning tube, illuminating the still center of the storm.
>
> Stretching away from them, in every direction, as far as Piya's eye could reach, was a heaving carpet of leaves: almost nothing was visible of the water's surface; the usual ripples, eddies and currents had disappeared under this layer of green. As for the island itself, it was entirely submerged and its shape could only be deduced from the few thickets of trees whose uppermost reaches were still visible above water. These trees had a skeletal, forlorn look; few had any branches remaining and there was scarcely one that still had a leaf attached. Many had been snapped in half and reduced to shattered stumps.
>
> A white cloud came floating down from the sky and settled on the remnants of the drowned forest. It was a flock of white birds and they were so exhausted as to be oblivious of Piya and Fokir. Piya loosened the knot in the sari and pushed back from the tree to stretch her aching limbs. One of the birds was so close she was able to pick it up in her hands: it was trembling and she could feel the fluttering of its heart. Evidently the birds had been trying to stay within the storm's eye. How far had they flown? Piya could not imagine. Releasing the bird, she rested her back against the tree.[৫]

ফকিরের মৃত্যুর পর পিয়া আমেরিকায় ফিরে যায় ঠিকই, কিন্তু সুন্দরবন এবং ফকিরের স্মৃতি তাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। পিয়া বুঝতে পারে যে, স্থানীয় মানুষদের বাদ দিয়ে কখনোই সুন্দরবনের মতো একটি জটিল বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানো সম্ভব নয়। পরিবেশ সংরক্ষণের নামে স্থানীয় মানুষদের উচ্ছেদ করার যে পশ্চিমা নীতি মরীচঝাঁপিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল, পিয়া তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পথ বেছে নেয়। সে পুনরায় সুন্দরবনে ফিরে আসে এবং স্থানীয় জেলেদের সাথে নিয়ে একটি নতুন পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার নতুন ডলফিন সংরক্ষণ ফাউন্ডেশনের নাম রাখে 'ফকির', যা স্থানীয় মানুষের চিরাচরিত জ্ঞান এবং আত্মত্যাগের প্রতি এক অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন। পিয়ার এই উদ্যোগটিই ইকোফেমিনিজমের মূল সুরটিকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে—যেখানে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় মানুষ উভয়কেই সমান মর্যাদায় পাশাপাশি বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

পরিবেশবাদী নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম আমাদের শেখায় যে, প্রকৃতির অবমূল্যায়ন এবং নারীর অবমূল্যায়ন একই পিতৃতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। 'দ্য হাংরি টাইড' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অমিতাভ ঘোষ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এই সত্যটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, নারী ও প্রকৃতি কেবল শোষণের প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় শিকার নয়, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রতিবাদী শক্তি। মানবজাতিকে যদি এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়, তবে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার বদলে, প্রকৃতির সাথে আমাদের একাত্ম হতে হবে। ডলফিন, বাঘ, ম্যানগ্রোভ বন এবং সুন্দরবনের দরিদ্র জেলে—সবাই এই পৃথিবীর সমান অংশীদার। নারী এবং প্রকৃতি—উভয়ই কেবল ব্যবহারের বা ভোগের সামগ্রী নয়, বরং তারা জীবনের মূল উৎস এবং শক্তির আধার। তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নয় বরং সম্মান, এবং আধিপত্য নয় বরং

পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই উপন্যাসের মাধ্যমে অমিতাভ ঘোষ ঠিক সেই পরিবেশগত এবং নারীবাদী চেতনারই উন্মেষ ঘটিয়েছেন, যা আমাদের একটি শোষণমুক্ত, টেকসই ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

তথ্যসূত্র:

১. Gaard, Greta. Living Interconnections with Animals and Nature. In Gaard, Greta (ed.). Ecofeminism: Women, Animals, Nature. Temple University Press, Philadelphia, 1993. P. 1.

২. Grune, Lori. Dismantling Oppression: An Analysis of the Connection Between Women and Animals. In Gaard, Greta (ed.). Ecofeminism: Women, Animals, Nature. Temple University Press, Philadelphia, 1993. p. 61.

৩. Ibid, p. 80.

৪. Ghosh, Amitav. The Hungry Tide, Penguin Books, India, 2019, p. 200.

৫. Ghosh, Amitav. The Hungry Tide, Penguin Books, India, 2019, p. 415.

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Díaz-Llabrés, Aina Maria & Jiménez-Rodríguez, Esther. "Women And Nature: Active Agents In Amitav Ghosh's The Hungry Tide And Sea Of Poppies. An Ecofeminist Reading." Indi@logs, Vol 12 (1) 2025. https://doi.org/10.5565/rev/indialogs.311

২. Gaard, Greta (ed.). Ecofeminism: Women, Animals, Nature. Temple University Press, Philadelphia, 1993.

৩. Ghosh, Amitav. The Hungry Tide, Penguin Books, India, 2019.

৪. Gaur, Arpana. "Ecofeminist Perspectives in Amitav Ghosh's The Hungry Tide and Gun Island." The SPL Journal of Literary Hermeneutics, Vol. 6, Issue 2, 2026.

৫. মণ্ডল, সুশান্ত। পৃথিবীর দেহ, নারীর দেহ: ইকোফেমিনিস্ট মেটাফর ও প্রতিরোধ, Sarkar. Partha Sarathi (Edited). Women, India & Development, Boi Aarot Publication, 2026.

৬. Rani, Sarita. "Ecofeminism in Arundhati Roy's the god of small things and Amitav Ghosh's the hungry tide and gun island." International Journal of Research in English, 2025.

৭. Verma, Rajesh Kumar. "The Hungry Tide of Amitav Ghosh: An Ecocritical Analysis." International Journal of Humanities Social Science and Management, Vol 4, Issue 4, 2024.